অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ শান্ত মন্ত্রোচচারণের মতো তাঁর কবিতা

কৃষ্ণা বসু

খুব একটি নির্জন ধ্যানের মতন, একটি আত্মস্থ উচ্চারণের নিমগ্নতার মতন নিবিষ্ট কবি-কর্মে আত্মনিবেদিত কবি-ব্যক্তিত্ব অমিয় চক্রবর্তী। ভিড়ের মাঝে তিনি একলা, কোলাহলের মাঝে তিনি নিমগ্ন, নীরবে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিকুলের মধ্যে তিনি জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে—এদের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধায় উচ্চারণযোগ্য তাঁর নাম। ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবিড় সঙ্গ স্নেহ লাভ করেছেন অমিয় চক্রবর্তী। এটি তাঁর জীবনের একটি পরম পাওয়া, চরম চরিতার্থতা। রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের কারণেই হয়তো তাঁর মেধা ও মননের মধ্যে অস্থিরতা বদলে দেখা গিয়েছিল এক ধ্রুব শান্তির বিন্দু, স্থির ধ্যানের সঙ্গীত। নেতির প্রবলতার পরিপার্শ্বের মধ্যে তিনি এক প্রবল ইতিবাচকতার কবি, এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর একথা দ্বিধাহীন উচ্চারণেই বলা যেতে পারে।

যখন অমিয় চক্রবর্তীর লেখনী আমাদের শোনায় বিরোধের নয়, মিলনের মন্ত্র তখন প্রাণ শান্তির প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়, শান্ত হয় ঃ

‘মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়া বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা
মেলাবেন।’

তখন এই অশ্বাস-বাক্যের শুশ্রূষায় সমগ্র দগ্ধ, বিক্ষুব্ধ, বিশুষ্ক সভ্যতার যেন নিরাময় হয়। এক নিরাময়ের মতো, এক শান্তির বচনের মতো বারে বারে জীবনের সত্যকে ধরতে চেয়েছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। যে জীবন আপাত উচ্চকিত নয়, যে জীবন তথাকথিত উজ্জ্বলতায় ঝলমল করে না, যে জীবন আপাত শান্ত ও স্থির ভাবে নিত্য বহমান সেই জীবনের মৃদু ও বহমান সঙ্গীতে ভরে উঠেছে কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার পৃথিবীটি। সেই বহমান সঙ্গীতের সুধা কানে এসে লাগে, — ‘ধান করো ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি।’ ধুলোর সংসারে এই মাটির গান তো ধান হয়ে দুলে ওঠে শস্যের প্রান্তরে, সেই গান ভরে রয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর ধ্যানময় স্থিতিময় কবিতার ভুবনটিতে।

সারাজীবন ভুবন পরিক্রমা করলেন এই কবি। রবীন্দ্রনাথের পরেই পৃথিবী পর্যটনে এত ব্যাপ্তি অমিয় চক্রবর্তীর মতো আর কারো জীবনে ঘটেনি। অধ্যাপনা করেছেন বিদেশে সুদীর্ঘদিন। এক ব্যাপ্ত আন্তর্জাতিক মন ও চিরন্তন ভারতীয় জীবনধারা এক আশ্চর্য সমীকরণে মিলে গিয়েছিলো তাঁর কবিতায়! প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘খসড়া’, তারপর পরপর ‘একমুঠো’, ‘মাটির দেয়াল’, অভিজ্ঞান বসন্ত, ‘দূরযানী’, ‘পারাপার’, ‘পালাবদল’, ‘ঘরে ফেরার দিন’, ‘হারানো অর্কিড’, ‘পুষ্পিত ইমেজ’, — সব কাব্য গ্রন্থেই ,কটি স্থিতিময় ধ্যানময় নিমগ্ন কণ্ঠের শান্তি গ্রীষ্ম দিনের দাবদাহের শেষে বৃষ্টি ধারার মতো ঝরে পড়েছে।

যখন শুনতে পাই এইসব আশ্চর্য উচ্চারণ যাতে আবহমানের স্বদেশের জীবনচিত্র দুলে ওঠে, জীবনের প্রতি ভালোবাসার গান দুলে ওঠে, তখনই বিমুগ্ধ স্মৃতিতে নিজেকেই আবৃত্তি করতে শুনি,

‘তারি জন্য শিশু আঙিনায়
দৌড়ে খেলে
হাট বসে
গৌরীপুরে জমে ব্যবসায়।’

এই রকম টুকরো কিন্তু বহমান, খন্ড কিন্তু অখন্ড জীবন-ছবিতে ভরে রেখে দিয়েছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী তার কাব্য গ্রন্থ গুলিকে। সুদীর্ঘ কালের বিদেশ বাসের ফলেও তাঁর কবিতা কোনদিনই আপন সংস্কৃতির মাটি থেকে শিকড় থেকে, শিকড়ের গানের থেকে সরে পড়ে যায় নি, দূরে চলে যায় নি।

অন্য সমস্ত আধুনিক কবিরা যখন শিকড়ের থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় ব্যথিত, কোন এক ধ্রুব বোধের জন্য নষ্ট মূল্যবোধের যুগে উদ্বিগ্ন, তখন, ঠিক সেই সময় কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁদের সেই অস্থির সময়ের পটভূমিকায় লিখে তুললেন শিকড়ে ফেরার গান, কানের কাছে শোনালেন জপ মন্ত্রের মতো অবিরাম,

‘তার বদলে পেল সমস্ত ঐ স্তব্ধ দুপুর,
নীল বাধানো স্বচ্ছ মুকুর,
আলোয় ভরা জল, ফুলে নোয়ানো ঐ ডালটা,
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরল হৃদয়-তল,
একলা বুকে সবই মেলে।’

এই ‘আছে আছে’, এই ভাঙা রিক্ত নিঃশেষিত জীবনে, ম জীবনে, মর জীবনে কিন্তু পাওয়া যায়, কিছু পাবার আছে, এই কথাটিই অমিয় চক্রবর্তী তার সারাজীবনের কবিতার প্রবন্ধে, সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন আলোচনায় প্রকাশ করে, প্রতিষ্ঠা করেই গিয়েছেন। তাঁর সমকালীন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন নেতির কথা, শূন্যের কথা, না পাওয়ার কথা, হাহাকার ভরা রিক্ততার কথা প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে বলে চলেছেন, ঠিক তখনই কবি অমিয় চক্রবর্তী কানে কানে অবিরাম বলে চলেছেন আছে, আছে জীবনের পরম শান্ত ধ্রুব কিন্তু পাওয়ার আছেই। এই ইতিবাচকতা তাঁর আসছে কিছুটা ব্যক্তিগত মনোগঠন থেকে, কিছুটা রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-নিবিড় সান্নিধ্য থেকে।

রবীন্দ্র দর্শনের ইতিবাচকতার একটি সুদূর-প্রসারী অত্যন্ত গভীর-সঞ্চারী এক প্রভাব কবি অমিয় চক্রবর্তীর উপর যথার্থ অর্থেই পড়েছিল একথা সংবেদনশীল বোদ্ধা পাঠক মাত্রেই অনুভব করতে পারবেন।

কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার জগতটি কোলাহল ও উচ্চকিত ঘোষণা দিয়ে শেষ হয়নি, পূর্ণ-ও ছিলনা তা কোনদিন তা দিয়ে, কবি অমিয় চক্রবর্তীর জগত এক নিচু গলায় গাওয়া জীবনের রসে ভরপুর অপরূপ গানে ভরা, তুচ্ছ সামান্যের মধ্য থেকেও তিনি অসামান্য জীবনধারা সংগ্রহ করে নিতে পেরেছিলেন — 'আহা পিঁপড়ে', এই উচ্চারণে সামান্য পিঁপড়ের 'ব্যস্ত মধুর চলা' কে শিল্পিত উচ্চারণে কবিতা করে তুললেন আমাদের কবি অমিয় চক্রবর্তী। বড় বিষয়ের পাশাপাশি ছোট বিষয়ের মধ্যেই যে জীবন, জীবনের যথার্থ গান বেজে ওঠে, একথা খুব বেশী করেই জানতেন তিনি। 'তার বদলে পেলে সাদা রাস্তা ধুলো পায়ে / খোলা ভাবনা কিছুই না-য়ের / কান্নাহারা হাওয়া / একলা বুকে সবাই মেলে' — 'বিনিময়' নামের সেই অবশ্য-স্মরণীয় কবিতাটিতে যে জীবনের সামান্যের মধ্যে অসামান্যের সংবাদ শোনাতে পেরেছিলেন, তার ঋণ তো শোধ করবার মতোও নয়।

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে একথা বলে দেবার-ও দরকার হয়না যে, জীবনানন্দ দাস সবচেয়ে বড় কবি, সেই জীবনানন্দও প্রেমের তাৎক্ষনিকতা, প্রেমের অচিরত্বকে গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন বাসনা কবিতায়। জীবনানন্দ শোনাচ্ছেন, 'একদিন এসেছিলে, দিয়েছিলেএক রাত্রি দিতে পারে যত', — এই তাৎক্ষণিকতা 'দেহ ঝরে — প্রেম ঝরে যায় তারও আগে',— এই প্রেমের মরণশীল ক্ষণত্ব জীবনানন্দ যেমন ভাবে উপলব্ধি করেছেন; সুধীন্দ্রনাথও তাকে প্রায় সেই দৃষ্টিতেই দেখতে পেয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ শোনাচ্ছেন — 'একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চুড়ে / ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী / একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে / থামিল কালের চঞ্চল গতি।' কিন্তু কালের চির চঞ্চল গতির থেমে থাকার পরেই আবার শোনাচ্ছেন 'যে ভোলে ভুলুক কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিব না আমি কভু ভুলিব না' — এই আমি ভুলবনা-র প্রতিশ্রুতি, এর মাঝেই নিহিত রয়েছে আরো একজনের প্রেমের বিস্তৃতিপরায়ণতার সুতীব্র সত্যটিও। কবি অমিয় চক্রবর্তী প্রেমের এই ক্ষণত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর শান্ত ধ্রুব জগতটিতে প্রেমও ছিল ধ্রুব ও শান্ত। জীবনের প্রতি স্থির বিশ্বাসে শোনাচ্ছেন অমিয় চক্রবর্তী,

'তাইতে আরোই বেশী ভাবি
ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনীর দাবী'

এই আশ্চর্যের জীবনীর দাবী, এই জীবন ও জীবনীর দাবীই সারা জীবন শুনিয়েছেন শান্ত মন্ত্রোচ্চারণের মতো কবি অমিয় চক্রবর্তী আমাদের। এ যেন অবিশ্বাসের, হতাশের, আশাহতের পৃথিবীর শান্তির মঙ্গল উপুর করে কে নামিয়ে দিল রিম্ ঝিম্ স্নিগ্ধ বর্ষন! বলেন তিনি — 'যা হয় তারই সে হওয়া আরোই উজ্জ্বল করে তুলি / কঠিন লাবণ্যে ছুঁই মনের অঙ্গুলি।

যা কিছু চেনা, সামান্য, মনের মালিন্য মাখা প্রাত্যহিক, তাতে কবি অমিয় চক্রবর্তী সংযোগ করলেন লাবণ্য আর উজ্জ্বলতা, মরমী মনের মাধুর্য। জীবনের ধারাবাহিকতায় বহমানতায়, পৌনপুনিকতায় তিনি খুঁজে পান যথার্থ জীবনরসিকের মতো প্রবহমান জীবনের প্রবাহিত হওয়ার, বিকশিত হওয়ার সত্য টুকুকে। এ যেন সেই অর্ধপূণ জলের গ্লাস, —জীবন যেন তাই; কেউ দেখেন আধখানা শূন্য কেউ দেখেন আধখানা পূর্ণ, কবি অমিয় চক্রবর্তী সেই দলে পড়েন, যাঁরা জীবনের পূর্ণতার দিকটিকে ঠিকঠাক দেখতে পান। শুনুন কবির মন্ত্রোচ্চারণের মতো জীবনসঙ্গীত, —

'বৃষ্টি ঝরে, চৈতন্যের বোধে
আবার আকাশ ভরে রোদে।'

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা যেন বরাভয়ের মুদ্রার মতো, সমস্ত শঙ্কা ও অবিশ্বাসের মধ্যে জাগিয়ে তোলে জীবনের স্বস্তির মন্ত্র, শান্তির সাম গানটিকে।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে তাঁর মিল ও যেন বোধিতে বিশ্বাস, অমিল অনেক রয়েছে যেখানে। আসুন পাঠক, আমাদের অবশ্যমান্য সমালোচক কবি প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর মত কান পেতে শুনি, 'তিনি কী শুনেছেন যা রবীন্দ্রনাথে নেই। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো যে এ দুজনের জগত মূলত এক হলেও উপাদানে ও বিন্যাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রধান কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্থিতিবোধ অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়িত্বের ভাব অমিয় চক্রবর্তীতে নেই — কোন আধুনিক কবিতাতে তা সম্ভব না।....তাঁর (অমিয় চক্রবর্তীর) রচনার মধ্যে যে মানুষটিকে আমরা দেখতে পাই সে অনবরত ঘুরে বেড়ায় এবং বাসাবদল করে। অস্থিরতার মধ্যে অন্তরতম গভীরের দিকে চোখ খুলে রাখে।' অমিয় চক্রবর্তীর এই রাবীন্দ্রিক ও রবীন্দ্রোত্তর, — উভয় মেজাজটিকেই বুঝে নিতে হবে আমাদের। তবেই তাঁর কবিতা অনুভব ও উপলব্ধি করার যোগ্যতা আমরা অর্জন করে নিতে পারব।

কবি আমাদের জীবনের প্রতি আধুনিক বিশ্বাসে শেখালেন,

'যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে বোধ জাগানো,
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠান্ডাজল, গানের কলি, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।'

এইসব সহজ সুন্দর বহমান জীবনের প্রাপ্তির প্রতি প্রসন্ন করে তোলে তাঁর কবিতা আমাদের।

অদ্ভুত এক প্রচ্ছন্নতা, অনুচ্চকিত, শান্ত, মৃদু উপকরণে ভরা তাঁর কবিতা, বলেইছি, নিম্নকণ্ঠে জীবনের গান গেয়েছেন তিনি। একটি সারল্য-স্তর আছে তাঁর কবিতায়, আছে এক ধরনের প্রসন্নতা, আছে আধুনিক কবিতার প্রকাশের মিত-ব্যয়িতা, আছে দ্রুত ভাবের উল্লম্ফন, আছে কথোপকথনের আন্তরিক হৃদ্য রীতি, — ওসবের হৃদয়সংবোধী, জীবনের প্রতি ইতিবাচক বিশ্বাসের আর এক নামই অমিয় চক্রবর্তী।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com